



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 201 - 207

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সুলেখা সান্যালের ছোটগল্পে নারীর ভাষায় সমকাল-দর্শন

শুভ রায়

গবেষক, বাংলা বিভাগ

কোচবিহার পঞ্চগনন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: shuvo.roy.blk@gmail.com

 0009-0001-5534-683X

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Women,
Rights,
Equal,
Custom,
Society,
liberation,
Education,
Freedom.

Abstract

Sulekha Sanyal emerged in the field of women's liberation by choosing the position of women in the 1940s and 50s as her subject. She appeared in Bengali literature amidst the world war, riots, independence movement, black marketing, and chaotic situations. As a short story writer, she clearly demonstrated that a woman is not just a woman, but a human being with rights equal to a man. Sulekha Sanyal was born on June 15, 1928. Her childhood was spent in the conservative environment of a landlord family in Korokodi, a remote village in the Faridpur district. Due to social conservatism, Sulekha had to pass her Matriculation exam by studying at home instead of attending school. The long-standing customs, superstitions, and restrictions of a conservative society could not suppress her. Breaking away from these societal norms, she stepped onto the path of women's liberation. Later, on December 4, 1962, she passed away from leukemia. In her personal life, Sulekha had to endure the traditional agony caused by society-imposed customs and restrictions. Therefore, entering the world of literature, she sought to highlight the position of women and strive for their liberation. Primarily through her short stories, she manifested the repressed and neglected status of women. Not only that, she endeavored to establish women with equal competence and dignity to men by providing them with education, freedom, rights, and financial solvency. Herein lies Sulekha Sanyal's achievement in women's liberation within Bengali literature.

Discussion

বিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলা সাহিত্যের নারী মুক্তিতে যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সুলেখা সান্যাল ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম একজন। ১৯২৮ সালের ১৫ই জুন ফরিদপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম কোড়কোদিতে সুলেখা সান্যালের জন্ম। জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করলেও রক্ষণশীল সমাজের বিধিনিষেধ সুলেখাকে আটকে রাখতে পারেনি। তাইতো রক্ষণশীল সমাজের প্রথা-সংস্কার ও বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে বাড়ির বৈঠকখানায় বসে পরীক্ষা দিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব অবস্থান তুলে ধরে নারী মুক্তিতে প্রয়াসী হয়েছেন। মার্কসবাদী চিন্তাচেতনায়

তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মাত্র ৩৪ বছর বয়সে লিউকোমিয়া ব্যাধিতে ১৯৬২ সালের ৪ ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, স্বাধীনতা আন্দোলন, অরাজকতা ও কালোবাজারির মধ্যে সাহিত্য জগতে সুলেখা সান্যালের প্রবেশ ঘটে। মনে-প্রাণে আধুনিক সচেতন সুলেখা প্রচলিত রীতি থেকে বেরিয়ে এসে সমাজে শোষিত, অবদমিত, নির্যাতিত নারীর অবস্থানকে পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন। নারী যে শুধু সেবা দাসী নয়, সন্তান প্রতিপালনকারী নয়, নারী যে পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী একথা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন তিনি। নারীকে শিক্ষা, স্বাধীনতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রদানের মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলে তাঁর গল্পের নারীরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সমাজের অবদমিত, অবহেলিত অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে। নিম্নে নারীর ভাষায়, কর্মে, দৃষ্টিতে সমাজের অবস্থানকে ছোটগল্পের মাধ্যমে আলোচনা করা হল —

নারীর আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠায় সুলেখা সান্যালের ‘সিন্দুরে মেঘ’ ছোটগল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম। গল্পটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে ‘পরিচয়’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মালতীর মধ্য দিয়ে বিশ শতকের নারী সমাজের মুক্ত স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত প্রথা-সংস্কারের গণ্ডিতে চিরকাল থেকে নারী হয়ে আসছে শোষিত, নিপীড়িত। সেবা, গৃহশ্রম ও সংসার প্রতিপালনের মধ্যেই নারীর জীবনকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়ে আসছে। কিন্তু বিশ শতকের মধ্যভাগে এসে নারীরা শিক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধির বলে আপন অস্তিত্ব, মর্যাদা, অধিকারের প্রতি সচেতন হতে শুরু করে। নারী এখন আর পুরুষের কর্তৃত্বের অধীনে জীবন অতিবাহিত করতে চায় না। নারী চায় আপন অস্তিত্বের স্বীকৃতি, পূর্ণ অধিকার আর সামাজিক সম্মান। গল্পে মালতীও স্বামীর শাসনের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে প্রয়াসী হয়েছে এই প্রতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে হাতিয়ার করে। তাইতো স্বামী অনন্তের পূর্ব স্ত্রীকে শাসুড়ি প্রণাম করতে বললে মালতী প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে আপন অস্তিত্বের জানান দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। মালতী ছবিতে প্রণাম করেনি। জেদি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়েছিল শাসুড়ি কথা অমান্য করে। শুধু তাই নয়, অনন্তকে পূর্ব স্ত্রীর ছবিতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখলে মালতী প্রকাশ্যেই বিরোধিতা করে পরিবারের অভ্যন্তরে আপন মর্যাদার গুরুত্বকে বুঝিয়ে দিয়েছে। মালতীর কথায় তা স্পষ্ট—

“অতই যদি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলার ব্যাপার তবে আবার বিয়ে করলে কেন তুমি?”^১

মালতীর এই উক্তি আসলে সমকালীন শিক্ষিতা নারী সমাজকেই প্রকাশ করে। বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি ও কালোবাজারিতে গোটা দেশের পুরুষেরা যখন কর্মহীনতায় ভুগছিল সেই সময়ে নারীরা তাদের বিদ্যা-বুদ্ধির জোরে কর্মে যোগদান করে অর্থ উপার্জনে ব্রতী হয়। অর্থ উপার্জনের দ্বারা নারীরা একদিকে যেমন স্বনির্ভর হতে সক্ষম হয়েছে তেমনি উপার্জিত অর্থের দ্বারা পরিবার, সংসারের হাল ধরেছে। স্বামী বিনয়ের বেকারত্বে মানদা তাই প্রতিবাদ করেছে, সমাজের অবস্থানকে তুলে ধরে দেখিয়েছে। মানদা কথায় স্পষ্ট—

“যুদ্ধের সময়! কত বসে থাকা লোক চাকরি পাচ্ছে, কচি কচি মেয়েগুলো পর্যন্ত একশো-দেড়শো করে ঘরে আনছে! আর তুমি চাকরে মানুষ কিনা, চাকরি খুইয়ে বাড়ি ফিরলে— হ্যাঁ গো?”^২

মানদার মন্তব্যেই সমকালীন সমাজের নারী স্বনির্ভরতার বাস্তব রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্থ উপার্জনের মধ্য দিয়ে নারীরা ধীরে ধীরে পরিবারের অভ্যন্তরে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতি তৎপর হয়েছে। কেননা নারীরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে নারীকে পুরুষ সমাজ সৃষ্ট প্রথা-সংস্কারের গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে সমান মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করতে হলে স্বনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। মালতীও বাবার অসুস্থতায় ঘরে বসে না থেকে বাইরে বেরিয়ে কর্মের মাধ্যমে উপার্জন করতে চেয়েছে। সামাজিক সংস্কারবশত মালতীর চাকরি করবার সিদ্ধান্ত মায়ের মনোপুত হয়নি। কেননা সমাজে নারীরা যে পুরুষের মতো সমান যোগ্যতায় চাকরি করে অর্থ উপার্জন করতে পারে তা মানদা ভাবতে পারেনি। তাই মালতী চাকরি করতে চাইলে সংস্কার-বিধিনিষেধজরিত মানদা গলায় দড়ি দেবার কথা বলে ওঠে। কিন্তু শিক্ষিতা সচেতন মালতী সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ না

থেকে অর্থ উপার্জনের প্রতি সচেতন হয়। মালতী উপলব্ধি করেছিল অর্থ উপার্জনের দ্বারাই পরিবার আর সম্মান দুটোই অর্জন করতে সক্ষম হবে। মালতীর কথায়—

“তবে চলবে কী করে শনি? বাবার একটু পথি জুটছে না? মন্টুটার পড়া বন্ধ। রোজ রোজ তোমার ওই উঠোনের পুঁইয়ের চচ্চড়ি আর ভাত—পারব না খেতে। কখখনো না।”^৩

নারীরা সমাজে পুরুষের সমান যোগ্যতায় কর্মে যোগদানের অধিকার পেলেও নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পায়নি। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বত্রই নারী প্রতিনিয়ত শোষিত, নির্যাতিত হয়ে আসছে পুরুষের দ্বারা। গল্পকার সুলেখা সান্যাল রেখা, শেফালি, মালতীর মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতনের বাস্তব রূপকে পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন। চাকরিরত অবস্থায় বহু নারী শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে আসছে অফিসারদের হাতে। শেফালির কথায় স্পষ্ট পরিস্ফুট—

“সে টাকা তো তোমাকে আদায় করে নিতে হবে। আসল টাকায় তোমার হবে নাকি কিছু? উপরি পাওনা নেই বুঝি? সে তো অফিসারদের হাত। দেখিসনি আমাদের ক্লাসের রেখাকে? ও তো তিন-চারশো টাকা পায় মাসে। সব বড়ো অফিসারদের সঙ্গে ওর ভাব। গালে একটা টোকা মেরে বলেছিল, ধ্যেত তুই ভারি বোকা। ঢুকেছিস তো, এবার বুঝবি। ওদের খুশি রাখবি। তোর যা চেহারা, সবাই দেখবি সেধেই আসবে!”^৪

শেফালির কথায় সমাজে নারীর ওপর পুরুষের শোষণের নিকৃষ্ট রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। সমাজের এই শোষণ, নির্যাতনের মধ্যেও শেফালি, রেখা, মালতীর মতো নারীরা থেমে থাকেনি। কর্ম ও উপার্জনের মধ্য দিয়ে অর্জন করে নিতে সচেষ্ট হয়েছে আপন অস্তিত্বকে, সামাজিক সম্মানকে। ফলে মালতীর কাছে বিয়ের থেকে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবারের কথা, সংসারের কথা, জীবনধারণের কথা। মালতীর মতো নারীরা উপার্জনের দ্বারা পরিবারের দায়িত্ব হাতে নেবার ফলে পরিবারের অভ্যন্তরে পুরুষের কর্তৃত্বের বেড়া জাল ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে। তাইতো মানদা গলায় দড়ি দিতে চাইলে মালতী বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা বলে ওঠে—

“তুমি, মন্টু এদের দেখবে কে?”^৫

বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দেশের পুরুষেরা কর্মহীন হয়ে পরলে নারীরা তাদের বিদ্যা-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে রক্ষণশীল গৃহজীবন ত্যাগ করে উপার্জনে ব্রতী হয়েছে। বস্তুত গল্পকার সুলেখা সান্যাল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে আবদ্ধ নারী সমাজকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার দ্বারা। কারণ একমাত্র স্বনির্ভরতাই নারী এনে দিতে সক্ষম পূর্ণ স্বাধীনতা ও শোষণ মুক্ত জীবন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীরা শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা কীভাবে আপন অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হয়েছিল ‘ফল্গু’ গল্পটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শিক্ষিতা সংস্কারমুক্তা বরণা ও সামাজিক প্রথা-সংস্কারে আবদ্ধ মহেশ্বরীর মধ্য দিয়ে গল্পটি বর্ণিত। মহেশ্বরী প্রাচীনপন্থী সংস্কারে বিশ্বাসী গ্রাম্য নারী। অপরদিকে বরণা শহুরে শিক্ষিতা আধুনিক নারী। দমনমূলক প্রচলিত সংস্কার, প্রথা, আচার বরণাকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। কিন্তু পিসি মহেশ্বরীর সংস্কারাচ্ছন্ন মন বিরক্তিতে ভোরে ওঠে আধুনিকচেতা বরণাকে দেখে। শুরুতেই তার স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার—

“প্রথম দৃষ্টিতেই বুকের মধ্যেটা কোথায় যেন মোচড় দিয়ে উঠল, মুখের খাঁচ, চোখের দৃষ্টি তার মরে যাওয়া মেয়েটার মত—চঞ্চল ছেলেমানুষি মাখানো। কিন্তু সেটা মিলিয়ে গিয়ে এবার বিরক্তি ফুটে উঠল চোখে, লক্ষ করলেন মাথার ঘোমটা ফেলা, এয়োতির চিহ্ন ছাড়া, জুতো হাতে চশমা চোখে মেয়েটাকে। দেখলেন, দেখে রাগ হলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, ভুরু কুঁচকে উঠল। ...”^৬

বরণার এই আচরণে সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য পিসির মনকে বিধিয়ে দিয়েছিল। কেননা প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী চৌধুরী বাড়ির বউয়েদের এভাবে প্রকাশ্যে রাস্তায় চলার অধিকার নেই। চৌধুরী বাড়ির ছোটছেলের বউ যে এভাবে সারা রাস্তা হেঁটে

আসতে পারে তা দেখেই মহেশ্বরী লজ্জায় মরে গিয়েছিলেন। নয় বছর বয়সে বিয়ে হয়ে চোদ্দ বছরে মেয়ে হাতে নিয়ে বিধবা হন মহেশ্বরী। ছোট করে চুল ছেঁটে, খাটো খান কাপড় পড়ে বহু সামাজিক সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ জীবন অতিবাহিত করে আসছেন। অপরদিকে সামাজিক সংস্কার মুক্ত আধুনিক বরণার কাছে জাতপাতের ভেদাভেদ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরণার কথায় স্পষ্ট—

“একটা আট মাসের শিশুকে কোলের ওপর নাচাতে নাচাতে হেসে উঠল, দেখুন, এটা জন্মেছে তো পাকিস্তান হবার পর, কিন্তু নাম রেখেছে দেখেছেন— হাবিব না, মনসুর না— নাম নাকি অমূল্য।”^{১৭}

বরণা গ্রামের একপাল ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে বনভোজন করেছে। চিরকালের প্রথাকে ভেঙে বরণা পাত পেতে বসে খেয়েছে সবার সঙ্গে। সেখানে ছিল না কোন জাত— ডোমপাড়ার ছেলেমেয়েগুলো, বাগদিদের আর মুসলমানদের একপাল। বরণা স্পষ্ট করে পিসিমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সামাজিক সংস্কার ও জাতপাতের ভেদাভেদ থেকে বড় হল মনুষ্যত্ব। বরণা জানায়—

“কী আপনাদের চিরকালের প্রথা— ওদের সঙ্গে কুকুর-শেয়ালের মতো ব্যবহার করা, দূর দূর করা, এই তো? গ্রামটায় আছে কে বলুন? ওদের অমন করলে দম আটকে আসবে না? থাকবেন কী করে! মতিকে রান্নার কাজে দিয়েছি তাই তো এত আপত্তি! খাব তো আমিই, যায় আমার জাত যাবে।”^{১৮}

ছত্রিশ জাতের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করা মহেশ্বরীর কাছে একদম মনোপুত হয়নি। কেননা সামাজিক সংস্কারে বাগদি, মুসলমানদের সঙ্গে রয়েছে বিস্তর ভেদাভেদ। স্বাভাবিক লজ্জা বলতে নেই বরণার। প্রকাশ্যে দাঁড়িয়ে এয়োতির চিহ্ন ছাড়া ঘোমটা ছাড়া স্বামী অবিনাশের সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে না সে। বরণা যেন জোর গলায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে মানিনে আমরা কিছুই। জাত বিচার না— হিন্দু-মুসলমান না, দেশ ভাগাভাগি না। তাইতো প্রকাশ্যে চোঁচিয়ে গান করতে পিছুপা হয়নি বরণা। মহেশ্বরীর কথায় স্পষ্ট—

“ওরে ও স্বামীসোহাগী! এ বাড়ির বউ না তুই। অমন চোঁচিয়ে গান করিস—এ বাড়ির মেয়েরাও তো অমন করতে সাহস পায়নি, লজ্জা নেই তোর।”^{১৯}

সমাজে নারীরা যে কতো বিধিনিষেধের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতো মহেশ্বরীর কথায় স্পষ্ট পরিষ্কৃত হয়েছে। তাইতো বরণাকে মতির পা দু-হাতে তুলে নিয়ে ব্যান্ডেজ করতে দেখলে মহেশ্বরীর সংস্কারপূর্ণ মন তা মেনে নিতে পারেনি। তাই তিনি তীক্ষ্ণ সুরে বলেছেন—

“তুই নতুন দেখলি তাই। অমন কত পড়েছে ওদের বাবা-কাকারা। নিজেরাই তেল-জল দিয়ে মালিশ করে আবার কাজকন্মে লেগেছে। তার জন্যে ঠাকুরঘরের সামনে বসে কোনো মুসলমান মুনিষের পা বাঁধতে হয়নি এ-বাড়ির কোনো বউকে। তুই কি এ-বাড়ির কিছুই মানবিনে?”^{২০}

সমাজে জাতপাতের ভেদাভেদ কতটা তীক্ষ্ণ পর্যায়ে ছিল মহেশ্বরীর কথায় তা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। হিন্দু বিধবা নারীদের জীবন ছিল বিধিনিষেধ সংস্কারে ভরা। কিন্তু শহুরেবাসী আধুনিক শিক্ষিতা বরণার চিন্তাচেতনায় রয়েছে বিস্তর ফারাক। জাতপাতের ভেদাভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য, প্রথা-সংস্কার কোনো কিছুই বরণার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাইতো বিনা দ্বিধায় বলতে পেরেছে—

“চাঁড়ালপাড়া, মুসলমানপাড়াটা একবার ঘুরেই এলাম। চলেই তো যাব কাল পরশু, এই দুদিন না হয় আপনার জলেটলে আর হাত দেব না—রান্নাঘরেও যাব না।”^{২১}

বরুণার এই সাহসিকতা সংস্কারাচ্ছন্ন মহেশ্বরীকে একসময় বিচলিত করে তোলে। চৌধুরী বাড়ির বউ হয়ে পালকির বদলে স্টেশনে হেঁটে যাবার সিদ্ধান্ত বরুণার সংস্কারমুক্ত আধুনিক মননকে প্রকাশ করে। বরুণার মধ্য দিয়ে গল্পকার সুলেখা সান্যাল সমাজে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরে তা থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। বরুণার কথায় স্পষ্ট—

“কই পিসিমা দেখুন তো, ওর গায়ে কি ওর জাত লেখা আছে? আমার গায়ে আমার জাত? আছে লেখা?”^{২২}

বিশ শতকের শেষার্ধ্বে এসে নারীরা আর গৃহবন্দী হয়ে থাকেনি। শিক্ষা, সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা কীভাবে নারীরা সামাজিক বিধিনিষেধ, প্রথা-সংস্কার, জাতপাত, লিঙ্গ বৈষম্যকে দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিল বরুণার মধ্য দিয়ে তা পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন গল্পকার সুলেখা সান্যাল।

‘মামণি’ গল্পেও গল্পকার সুলেখা সান্যাল সমাজে নারীর প্রতিবাদী সচেতন রূপকে পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন। ১৩৫৬-এর ভাদ্রে ‘ইস্পাত’ পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, কালোবাজারিতে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হলে দেশের বহু পুরুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। সমাজের এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে দেশের নারীরা নিজেদের ঘরের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে কর্মের মধ্য দিয়ে, প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজেছে। গল্পেও দেখা যায় দেশের মামণিরা মিটিং, মিছিলের দ্বারা প্রতিবাদ করে পথে নেমেছে অরাজকতার বিরুদ্ধে, কালোবাজারির বিরুদ্ধে। শুরুতেই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন গল্পকার—

“সভা করতে যায় মামণি, সেখানে নাকি খোকনের যেতে নেই। মা কি কেবল একা ওসব করবে! খোকনরা নাকি বড়ো হয়ে যাতে খুব ভালোভাবে থাকতে পারে মামণি সেই জন্যে মিটিং করতে যায়।...”^{২৩}

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ্বে শিক্ষিত আধুনিক নারীরা সভা, মিছিল, প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন সমাজের পুঁজিবাদী স্বার্থান্বেষী শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নেমেছে তেমনি প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছে নিজেদের, মতামতকে, ব্যক্তিস্বাধীনতাকে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের দ্বারা নারীরা বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারাও পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী। তাইতো উচ্চশ্রেণির অন্যান্যের প্রতিবাদে জেলে যেতে হয়েছে পল্টুর বাবাকে, খোকনের বাবাকে। কিন্তু তবুও তারা চুপ করে থাকেনি, প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে নিতে সচেষ্ট হয়েছে নিজেদের অধিকারকে। ফলে পুরুষের পাশাপাশি দেশের নারীরাও সমান উদ্যোগে পথে নেমেছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে। মামণির কথায় তা স্পষ্ট—

“আমাদের যারা এখন মন্ত্রী আর রাজা তারা যে সব বড়োলোক খোকন, গরিবদের জন্যে কী ওদের মায়া হয়? ওদের তাড়াতে হবে তো— তাই তো আমি তোমাকে ফেলে মাঝে মাঝে মিটিং করতে যাই।”^{২৪}

গৃহকর্ম ও সংসার সেবার মধ্যে নারীরা তাদের জীবনকে সীমাবদ্ধ করে রাখেনি। সভা, মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ ছাড়াও স্বনির্ভর হবার মধ্য দিয়ে নারী নিজের ও পরিবারের ভার নিজের হাতে নিয়েছে। ফলে দেখা যায় স্বামীর অনুপস্থিতিতে বহু মামণিরা স্বনির্ভর হয়ে অর্থ উপার্জন করে সংসারের ভার বহন করেছে। খোকনের মাকেও তাই স্কুলের চাকরির সঙ্গে টিউশানি করতে হয়েছে। মামণির কথায়—

“চাকরি না করলে কী করে চালাব খোকন? তোমার বাপি নেই— জিনিসপত্রের যা দাম! এত কষ্ট করেও তোমাকে একটু ভালো করে খেতে দিতে পারি না— একটা চকলেট দিতে পারি না। এত ভালোবাসো!”^{২৫}

সভা, মিছিলের কারণে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করলেও নারীরা তাদের আওয়াজকে দমিয়ে রাখেনি। প্রশাসনের দ্বারা জেলের মধ্যে সাধারণ মানুষেরা বন্দী হয়ে কীভাবে জীবন অতিবাহিত করছে তাকে তুলে ধরার অপরাধে চারজনকে পুলিশ গুলিবিদ্ধ করে মেরেছে। তার হাত থেকে রক্ষা পায়নি খোকনের মা, পল্টুর সহ বহু মামণিরা। সমাজের এই রূপটিকে খোকনের দ্বারা পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন গল্পকার—

“আমাদের মামণিরা, জেলের মধ্যে বাপিদের ওদের কষ্ট দিচ্ছে সেই কথা সবাইকে জানাবার জন্যে রাস্তায় যাচ্ছিল, সেই সময় গুলি করে মামণিদের মেরে ফেলেছে পুলিশ, পল্টুর মা-কেও। মামণি বলেছে আমি বড়ো হয়েছি—আরও যখন বড়ো হব তখন ওরা গুলি করবে—মামণিকে যারা মেরেছে...”^{১৬}

এখানে গল্পকার প্রকাশ্যে নারীর প্রতিবাদী চেতনাকে পরিস্ফুট করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হলে নারী তাদের আত্মশক্তি ও প্রতিবাদী মনোভাবের দ্বারা পথে নামতে শুরু করে। শুধু তাই নয় স্বনির্ভর হবার মধ্য দিয়ে নারী তাদের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদাকে মেটাতে সচেষ্ট হয়েছে। ফলে পরিবারের অভ্যন্তরে চিরকাল ধরে চলে আসা একচেটিয়া পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ধীরে ধীরে নারীদের হাতে আসতে শুরু করে।

বিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারী মুক্তিতে সুলেখা সান্যালের অবদান ছিল অসামান্য। রক্ষণশীল প্রথাবদ্ধ সমাজ থেকে উঠে এসে নারীর শিক্ষা, অধিকার, মর্যাদার প্রতি সোচ্চার হয়েছিলেন সুলেখা সান্যাল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চিরকাল ধরে নারীকে দেখা হয়ে আসছে দাসী হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, সন্তান প্রতিপালনকারী হিসেবে। জন্ম থেকে বিবাহ এবং বিবাহ থেকে মৃত্যু জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই নারীকে পুরুষের ওপর নির্ভর করে আসতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কখনই চায় না নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠুক, সমাজ অধিকার লাভ করুক। কিন্তু বিশ শতকের মধ্য ভাগে এসে নারীরা আর নিজেদের গৃহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়নি। শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার মধ্য দিয়ে নারী অর্জন করতে প্রয়াসী হয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমান অধিকার, মর্যাদা। নারী যে শুধু নারী নয়, নারী যে মানুষ একথা স্পষ্ট পরিস্ফুট করে দেখিয়েছেন গল্পকার সুলেখা সান্যাল। তাই তিনি নারীর শিক্ষালাভ, স্বনির্ভরতা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের দ্বারা সামাজিক প্রতিষ্ঠা দানে সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন নারীকে পুরুষের শোষণ, নির্যাতন থেকে মুক্ত হতে হলে প্রয়োজন নারীর সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা। তাই তিনি পুরুষের চোখ দিয়ে নয়, নারীর চোখ দিয়ে সমাজে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরে নারীর প্রতিষ্ঠাদানে প্রয়াসী হয়েছেন। আর এখানেই নারী মুক্তিতে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা দানে গল্পকার সুলেখা সান্যালের কৃতিত্ব।

Reference:

১. অধিকারী, গৌতম, সুলেখা সান্যাল রচনা সমগ্র, কথারূপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১০
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. তদেব, পৃ. ১২
৪. তদেব, পৃ. ৮
৫. তদেব, পৃ. ১৪
৬. তদেব, পৃ. ২১
৭. তদেব, পৃ. ২২
৮. তদেব
৯. তদেব, পৃ. ২৪
১০. তদেব, পৃ. ২৫
১১. তদেব, পৃ. ২৬
১২. তদেব, পৃ. ২৭
১৩. তদেব, পৃ. ৪৭
১৪. তদেব, পৃ. ৪৮
১৫. তদেব, পৃ. ৫০
১৬. তদেব, পৃ. ৫১

Bibliography:

আকর গ্রন্থ -

অধিকারী গৌতম, সুলেখা সান্যাল রচনা সমগ্র, কথারূপ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩

সহায়ক গ্রন্থ -

সেনগুপ্ত মল্লিকা, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২২

মণ্ডল মলয়, নারীবাদী তত্ত্ব - একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রথ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১

বসু রাজশ্রী, নারীবাদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০২২